জিরো

অধ্যায় সাত

পরম শূন্য

[পদার্থবিদ্যায় শূন্য]

গণিতে কোনো রাশি অতিশয় বড় ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলে নয়, বরং রাশি ছোট হলে তাকে উপেক্ষা করা সুবিবেচনার কাজ। — পল ডিরাক

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। অসীম আর শূন্য অবিচ্ছেদ্য। গণিতের অপরিহার্য অংশ। গণিতবিদরা বুঝলেন, এদেরকে সাথে নিয়েই চলতে হবে। তবে পদার্থবিদদের কাছে মনে হচ্ছিল, মহাবিশ্বের কাজকর্মে শূন্যের কোনো ভূমিকা নেই। অসীমকে যোগ করা ও শূন্য দিয়ে ভাগ করা গণিতের কাজ হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি এভাবে কাজ করে না।

বিজ্ঞানীরা অন্তত এমনটাই আশা করেছিলেন। একদিকে গণিতবিদরা শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক আবিষ্কার করছেন। ওদিকে শূন্য গণিতের চৌহদ্দি পেরিয়ে চলে এল পদার্থবিদ্যায়। তাপগতিবিদ্যায় (thermodynamics) শূন্য হয়ে গেল অনতিক্রম্য এক বাধা। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতায় শূন্য হয়ে গেল কৃষ্ণগহ্বর। দানবীয় যে তারা গিলে খায় বহু নক্ষত্র। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় শূন্য শক্তির এক অদ্ভুত উৎস। গভীরতম ভ্যাকুয়ামেও (শূন্যস্থান) আছে যার উপস্থিতি। তৈরি করে এক ভূতুড়ে বল, যার নেই কোনো উৎস।

শূন্য তাপ

পরিমাপের বিষয়কে সংখ্যায় প্রকাশ করা গেলে এটা সম্পর্কে কিছু জানা যায়। কিন্তু একে পরিমাপ করা না গেলে ও সংখ্যায় প্রকাশ করা না গেলে জ্ঞান থাকে নগণ্য ও অতৃপ্তিদায়ক। হয়তোবা এটা জ্ঞানের সূচনা। তবে এসব চিন্তা আপানকে বিজ্ঞানের পথে বেশিদূর অগ্রসর করেনি। — উইলিয়াম থমসন, লর্ড কেলভিন

পদার্থবিদ্যায় শূন্যের প্রথম অনিবার্য উপস্থিতি দেখা যায় অর্ধশতক ধরে ব্যবহৃত একটি সূত্রে। ১৭৮৭ সালে ফরাসি পদার্থ জাক সূত্রটা আবিষ্কার করেন। হাইড্রোজেন বেলুনে উড়ে তিনি ততদিনে এমনিতেই বিখ্যাত। তবে উড্ডয়ন তেলেসমাতির জন্য নয়, তিনি ইতিহাসে অমর হন তাঁর নামে নাম দেওয়া সূত্রটার (শার্লের সূত্র) কারণে।

গ্যাসের নানান ধরনের বৈশিষ্ট্য সমকালীন অনেক পদার্থবিদের মতো শার্লকেও অভিভূত করে। অক্সিজেন কয়লাকে শিখায় পরিণত করে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড আবার তাকে নিভিয়ে দেয়। প্রাণঘাতী ক্লোরিনের রং সবুজ। নাইট্রাস অক্সাইডের নেই রং, তবে মানুষ হাসাতে ওস্তাদ। তবে আলাদা আলাদা এ গ্যাসগুলোর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য একইরকম। তাপ দিলে এরা প্রসারিত হয়। আর ঠাণ্ডা করলে হয় সঙ্কুচিত।

শার্লে আবিষ্কার করেন, এ আচরণ অত্যন্ত নিয়মিত ও অনুমানযোগ্য। যেকোনো দুটি আলাদা গ্যাস সমান পরিমাণে নিন। রাখুন একই ধরনের বেলুনের ভেতরে। তাদেরকে একই পরিমাণ তাপ দিন। দেখবেন, তারা সমান প্রসারিত হচ্ছে। ঠাণ্ডা করলেও একইসমান সঙ্কুচিত হচ্ছে। এছাড়াও তাপমাত্রা প্রতি ডিগ্রি বাড়া বা কমার জন্য আয়তনের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ বাড়বে বা কমবে। শার্লের সূত্র থেকে গ্যাসের তাপমাত্রা ও আয়তনের সম্পর্ক পাওয়া যায়।

তবে ১৮৫০-এর দশকে ব্রিটিশ পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন শার্লের সূত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেন। সমস্যাটা শূন্য নিয়ে। তাপমাত্রা কমালে বেলুনের আয়তন ক্রমেই কমতে থাকে। তাপমাত্রা নির্দিষ্ট হারে কমাতে থাকলে বেলুনও নির্দিষ্ট হারে চুপসে যেতে থাকবে। তবে সেটা চিরকাল সম্ভব নয়। তাত্ত্বিকভাবে এমন একটি বিন্দু আছে, যেখানে গ্যাস কোনো জায়গায়ই দখল করে না। শার্লের সূত্র বলে, একটি গ্যাস বেলুন চুপসে গিয়ে অবশ্যই শূন্য পরিমাণ স্থান দখল করবে। নিঃসন্দেহে সর্বনিম্ন সম্ভাব্য আয়তন শূন্য। এ বিন্দুতে পৌঁছে গ্যাস আর কোনো জায়গা দখল করে না। (অবশ্যই গ্যাসের আয়তন ঋণাত্মক হতে পারে না।) গ্যাসের আয়তন এর তাপমাত্রার সাথে সম্পর্কিত বিধায় সর্বনিম্ন আয়তন থাকলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও থাকবে। একটি গ্যাস অনন্তকাল ধরে শীতল হতে থাকবে—সেটা সম্ভব নয়। একটা সময় বেলুনকে আর ছোট করা না গেলে তাপমাত্রাও আর কমানো যাবে না। এটাই পরম শূন্য। সর্বনিম্ন সম্ভাব্য তাপমাত্রা। যার মান পানির হিমাঙ্কের নিচে ২৭৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের একটু বেশি। অন্য কথায় (-২৭৩) ডিগ্রি সেলসিয়াস১।

থমসন অর্ড কেলভিন নামেই বেশি পরিচিত। আর কেলভিনের নামেই তাপমাত্রার সার্বজনীন স্কেলের নাম দেওয়া হয়েছে। সেলসিয়াস স্কেলে শূন্য ডিগ্রি হলো পানির হিমাঙ্ক। যে তাপমাত্রায় পানি জমে বরফ হয়। কেলভিন স্কেলে শূন্য হলো পরম শূন্য।

পরম শূন্য অবস্থায় এক পাত্র গ্যাসের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। বাস্তবে এটা কখনোই করা যাবে না। একটা বস্তুর তাপমাত্রা কমিয়ে কখনোই পরম শূন্য করা যাবে না। তবে খুব কাছাকাছি যাওয়া যাবে। একটি উপায়ের নাম লেজার কুলিং। এক ডিগ্রিকে কয়েক লক্ষ ভাগ করলে যা হবে, এ পক্রিয়ায় পরম শূন্যের ততটা কাছাকাছি পর্যন্ত যাওয়া যায়। তবে ঐ বিশেষ বিন্দুটিতে পৌঁছতে চাইলে মহাবিশ্বের সবকিছু একজোট হয়ে বাধা দেবে। কারণ শক্তি আছে এমন যেকোনো কিছু এদিক-সেদিক লাফাবে। আলো বিকিরণ করবে। যেমন মানুষের দেহের উপাদান নিয়ে ভাবুন। কিছু পানির অণু ও কিছু জৈব মিশ্রণ দিয়ে আমরা গঠিত। এই সবগুলো পরমাণু স্থানের মধ্যে এদিক-সেদিক লাফাচ্ছে। তাপমাত্রা যত বেশি হবে, লাফাবে তত দ্রুত গতিতে। লাফিয়ে বেড়ানো এ অণুগুলো একে অপরের সাথে ধাক্কা খায়। লাফাতে বাধ্য করে পার্শ্ববর্তী অণুকেও।

ধরুন আমরা একটি কলার তাপমাত্রা পরম শূন্য করতে চাই। কলা থেকে সব শক্তি বের করে নিতে হলে এর পরমাণুগুলোর নড়াচড়া থামাতে হবে। একটি বক্সে রেখে কমাতে হবে এর তাপমাত্রা। তবে বক্সটাও তো পরমাণু দিয়েই তৈরি। সে পরমাণুও লাফাচ্ছে। তারা কলার পরমাণুকেও ধাক্কা দেবে। নড়িয়ে দেবে তাদেরকে। বাধ্য করবে লাফাতে। বক্সের কেন্দ্রে একটি নিখুঁত ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সেখানে কলাকে ভাসিয়ে রাখলেও কলার কণারা নড়াচড়া করবে। কারণ চলনশীল কণা আলো বিকিরণ করে। বক্স থেকে প্রতি মুহূর্তে আলো বের হচ্ছে। যা ধাক্কা দেবে কলার অণুকে। বাধ্য করবে চলাচলে।

রেফ্রিজারেটরের কয়েলের টুইজারের সবগুলো পরমাণু নড়ছে আর বিকিরণ দিচ্ছে। একই কাজ করছে এক পাত্র তরল নাইট্রোজেনের পরমাণুরা। ফলে বক্সের কম্পন ও বিকিরণ থেকে কলা প্রতিনিয়ত শক্তি শোষণ করছে। শক্তি নিচ্ছে টুইজার ও রেফ্রিজারেটরের কয়েল থেকে। বক্স থেকে কলাকে বর্ম দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা সম্ভব নয়। নয় টুইজার বা কয়েল থেকে। সেই বর্মও নড়ছে ও বিকিরণ দিচ্ছে। প্রতিটি বস্তু তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। অতএব, মহাবিশ্বের যেকোনো কিছুর তাপমাত্রা পরম শূন্যে নিয়ে আসা অসম্ভব। চাই সেটা কলা, বরফখণ্ড কিংবা খাবারের টুকরো হোক। এটা এল অনতিক্রম্য বাধা।

পরম শূন্যের আবিষ্কারের প্রভাব নিউটনের সূত্রের চেয়ে একদম ভিন্ন। নিউটনের সূত্রগুলো পদার্থবিদদের দেয় ক্ষমতা। এদের মাধ্যমে গ্রহের কক্ষপথ ও বস্তুর গতির পূর্বাভাস দেওয়া যায় খুব নির্ভুলভাবে। ওদিকে কেলভিনের পরম শূন্যের আবিষ্কার পদার্থবিদদের বলল, কী তারা করতে পারবে না। পরম শূন্যে কখনও পৌঁছা সম্ভব নয়। পদার্থবিদদের কাছে এ বাধা ছিল এক হতাশাজনক বাধা। তবে এর মাধ্যমে শুরু হয় তাপগতিবিদ্যা (thermodynamics) নামে পদার্থবিদ্যার নতুন এক শাখা।

তাপগতিবিদ্যায় তাপ ও শক্তির আচরণ নিয়ে কাজ করা হয়। কেলভিনের পরম শূন্যের আবিষ্কারের মতো তাপগতিবিদ্যার সূত্রগুলো একটি অনতিক্রম্য দেয়াল খাড়া করল, যা অতিক্রম করা শতচেষ্টার পরেও কোনো পদার্থবিদের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই যেমন তাপগতিবিদ্যা বলে, অবিরাম-গতি যন্ত্র বানানো অসম্ভব। উৎসাহী আবিষ্কারকরা পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ও বিজ্ঞান ম্যাগাজিনে অসাধারণ এ যন্ত্রের নকশা পাঠাতে লাগলেন। যে যন্ত্র কোনো শক্তি ছাড়াই চিরকাল চলতে পারে। তবে তাপগতিবিদ্যার সূত্র বলি মন যন্ত্র বানানো অসম্ভব। এটা আরেকটি কাজ, যা করা সম্ভব নয়। এমন যন্ত্রও বানানো সম্ভব নয়, যা কোনো শক্তি অপচয় না করেই চলতে পারে। তাপ আকারে কিছু শক্তি অপচয় হিসেবে মহাবিশ্বে যোগ হয়ে যাবেই। (তাপগতিবিদ্যা ক্যাসিনোর চেয়ে খারাপ। যত চেষ্টাই করুন, আপনি জিততে পারবে না। আপনি পাবেন না নিজের পুঁজিটাও।)

তাপগতিবিদ্যা থেকে এল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা (statistical mechanics) নামক শাখা। এক গুচ্ছ পরমাণুর সামষ্টিক গতি দেখে পদার্থবিদরা পদার্থের আচরণের পূর্বানুমান করতে পারেন। যেমন গ্যাসের পরিসংখ্যানিক বিবরণই শার্লের সূত্রের ব্যাখ্যা দেয়। গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে অণুরা গড়ে দ্রুত থেকে আরও দ্রুত চলাচল করে। পাত্রের দেয়ালে ধাক্কা দেয় জোরে জোরে। ফেল গ্যাস দেয়ালে জোরে ধাক্কা দেয়। চাপ বাড়তে থাকে। কণার নড়াচড়ার তত্ত্ব পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করল। এমনকি মনে হচ্ছিল, এটি আলোর প্রকৃতিরও ব্যাখ্যা দিয়ে দেবে।

আলোর প্রকৃতির সমস্যা বিজ্ঞানীদের বহু শতাব্দী পর্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। আইজ্যাক নিউটন মনে করতেন, আলো তৈরি কণা দিয়ে। যে কণা নির্গত হয় সব উজ্জ্বল বস্তু থেকে। তবে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতে শুরু করলেন, আলো কণা নয় বরং তরঙ্গ। ১৮০১ সালে একজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ আবিষ্কার করেন, আলো নিজের সাথে ব্যতিচার করে। দেখে মনে হলো, আলোর কণাধর্ম চিরতরে বাতিল হয়ে গেল।

সব ধরনের তরঙ্গেই ব্যতিচার হয়। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে বৃত্তাকার ঢেউ বা তরঙ্গ তৈরি হয়। পানি ওপরে-নিচে দোল খায়। আর বৃত্তাকার ভঙ্গিতে তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজ বাইরের দিকে চলতে থাকে। একইসাথে দুটি ঢিল ছুঁড়লে একে অপরের সাথে ব্যতিচার করে। একটি পাত্রে দুটি স্পন্দনশীল পিস্টন ডোবালেও এটা দেখা যাবে। এক পিস্টনের চূড়া আরেক পিস্টনের খাঁজের সাথে মিলিত হলে একে অপরকে বাতিল করে দেয়। ঢেউয়ের নকশায় ভাল করে চোখ রাখলে নিশ্চল তরঙ্গহীন পানি দেখা যাবে (চিত্র ৪৫)।

আলোর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। দুটি ছিদ্র আলো প্রবেশ করলে অন্ধকার ও তরঙ্গহীন অঞ্চল তৈরি হয় (চিত্র ৪৬)। (বাসায় বসেই অনেকটা একইরকম একটি চিত্র আপনি দেখতে পারেন। দুই আঙ্গুলকে এক করে ধরুন। মাঝে থাকবে সামান্য ফাঁক, যেখান দিয়ে আলো চলাচল করতে পারবে। সে ফাঁক দিয়ে আলোর দিকে তাকান। দেখবেন কিছু অন্ধকার রেখার উপস্থিতি। বিশেষ করে ফাঁকের উপর ও নিচের দিকে। এসব রেখাও আলোর তরঙ্গবৈশিষ্ট্যের ফল।) তরঙ্গ এভাবেই ব্যতিচার ঘটায়। কণারা তা করে না। ফলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হলো, ব্যতিচারের ঘটনা আলোর প্রকৃতি সম্পর্কে সব বিভ্রান্তির সমাধান করে ফেলল। পদার্থবিদরা সিদ্ধান্ত নিলেন, আলো কোনো কণা নয়। বরং তড়িৎ ও চুমকক্ষেত্রের তরঙ্গ।

১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে এটাই ছিল সবচেয়ে আধুনিক ধারণা। পরিসংখ্য্যানিক গতিবিদ্যার সাথে এটি পুরিপূর্ণরূপে মিলে যাচ্ছিল বলেই মনে হচ্ছিল। পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা বলে দেয় বস্তুর অণুরা কীভাবে লাফায়। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব বলল, এই আণবিক কম্পন কোনোভাবে বিকিরণের ঢেউ বা আলোকতরঙ্গ তৈরি করে। এর চেয়ে ভাল কথা হলো, একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর অণুরা তত দ্রুত লাফায়। একইসাথে একটি বস্তু যত উত্তপ্ত হয়, এর আলোর ঢেউয়ের শক্তি তত বেশি হয়। একদম নিখুঁত ভাবনা। আলোর তরঙ্গ যত দ্রুত উঠা-নামা করবে, এর কম্পাঙ্ক তত বেশি। (আবার কম্পাঙ্ক যত বেশি, তরঙ্গের দুই চূড়ার মাঝের দূরত্ব বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য তত কম।) তাপগতিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র স্টেফান-বোলজম্যান সমীকরণ। এ সমীকরণ আলোর কম্পনকে অণুর কম্পনের সাথে জোড়া দেয়। এটা থেকে বস্তুর তাপমাত্রার সাথে এর বিকিরিত মোট শক্তির পরিমাণের সম্পর্ক পাওয়া যায়। এটাই ছিল পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যা ও আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের সবচেয়ে বড় বিজয়। (এ সমীকরণ বলে, বিকিরিত শক্তি তাপমাত্রা চুতুর্থ ঘাতের সমানুপাতিক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি প্রদান করলে একটি বস্তু কী পরিমাণ বিকিরণ নির্গত করবে। পাশাপাশি এও বলে দেয়, বস্তুটি কতটা উত্তপ্ত হবে। পদার্থবিদ্যার এ সূত্র ও বাইবেলের ইসাইয়া পুস্তকের একটি অনুচ্ছেদ কাজে লাগিয়ে পদার্থবিদরা হিসাব করেছিলেন, স্বর্গের তাপমাত্রা ৫০০ ডিগ্রি কেলভিনের বেশি।

চিত্র ৪৫: পানিতে ব্যতিচারের দৃশ্য

চিত্র ৪৬: আলোর ব্যতিচার। বইটাকে পাশে ঘুরিয়ে পৃষ্ঠা বরাবর তাকালে ব্যতিচার নকশা দেখা যাবে।

তবে এ বিজয় বেশিদিন স্থায়ী হলো না। শতাব্দী পার হলে দুজন ব্রিটিশ পদার্থবিদ তরঙ্গ তত্ব কাজে লাগিয়ে একটি সরল সমস্যা সমাধান করতে চাইলেন। হিসাবটা মোটামুটি সোজাসাপ্টাই ছিল। তাঁরা বের করতে চাইলেন, একটি ফাঁকা গর্ত কতটুকু আলো বিকিরণ করে। ব্যবহার করলেন পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার মৌলিক সমীকরণ। যা বলে দেয়, অণুরা কতটুকু লাফালাফি করে। পাশাপাশি ব্যবহার করলেন তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ার সমীকরণ, যা বলে দেয়, আলো কীভাবে লাফায়। এর মাধ্যমে তাঁরা পেলেন আরেকটি সমীকরণ। যা বলে দিল, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গর্তের আলো কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণ দেবে।

দুই পদার্থবিদ লর্ড রেলি ও জেমস জিন্সের নামে এ সমীকরণের নাম রেলি-জিন্স সূত্র। বেশ ভাল কাজ করছিল সূত্রটা। উত্তপ্ত বস্তু থেকে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কম শক্তির আলোর পরিমাণ বের করতে সূত্রটা ভালোভাবে কাজ করছিল। কিন্তু উচ্চশক্তিতে সমীকরণটা ভুল ফল দিয়ে ফেলে। রেলি-জিন্স সূত্র বলে, একটি বস্তু ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ক্রমেই বেশি করে আলো নির্গত করতে থাকে। ফলে শক্তিও বেশি বেশি নির্গত করে। ফলে শূন্যের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বস্তুটি অসীম পরিমাণ উচ্চশক্তির আলো প্রদান করে। রেলি-জিন্স সমীকরণ অনুসারে প্রত্যেকটি বস্তু প্রতি মুহূর্তে অসীম পরিমাণ শক্তি বিকিরিত করছে। এটা বস্তুর তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না। এমনকি একটি বরফখণ্ডও প্রচুর পরিমাণ অতিবেগুনি, এক্স ও গামা রশ্মি বিকিরিত করে। যা দিয়ে চারপাশে সবকিছুকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। এ সমস্যার নাম ছিল অতিবেগুনি বিপর্যয়। শূন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য অসীম শক্তির সমান। এক গুচ্ছ সুন্দর সূত্রকে ধ্বংস করার হুমকি দিচ্ছিল শূন্য ও অসীম। এ সমস্যার সমাধান শীঘ্রই পদার্থবিদ্যার প্রধান ধাঁধাঁ হয়ে গেল।

রেলি ও জিন্স ভুল কিছু করেননি। তারা যে সমীকরণ ব্যবহার করেছেন, পদার্থবিদরা যাকে সঠিক মনে করতেন। সমীকরণ নিয়ে কাজ করেছেন নিয়ম মেনেই। কিন্তু যে উত্তর পেলেন তা বাস্তব বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে না। বরফখণ্ড গামা রশ্মি দিয়ে সভ্যতা ধ্বংস করে না। যদিও সেসময়ের পদার্থবিদ্যার সূত্র এমন ফলাফলের দিকে ঠেলে দেয়। পদার্থবিদ্যার একটি সূত্রকে তো তাহলে ভুল হতেই হবে। সেটি কোনটি?

কোয়ান্টাম শূন্য: অসীম শক্তি

পদার্থবিদরা মনে করেন ভ্যাকুয়ামের মধ্যে সব কণা ও বল সুপ্ত আছে। দর্শনের শূন্যের চেয়ে এটা অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ।

— স্যার মার্টিন রিজ

অতিবেগুনি বিপর্যয় থেকে জন্ম কোয়ান্টাম বিপ্লবের। আলোর চিরায়ত তত্ত্ব থেকে শূন্যকে বিদায় করল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তুখণ্ড থেকে বের হওয়া অসীম শক্তি দূর হলো। তবে এটা তেমন বড় কোনো বিজয় ছিল না। কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় শূন্যের অর্থ হলো পুরো মহাবিশ্ব—এমনকি ভ্যাকুয়ামেও আছে অসীম পরিমাণ শক্তি। এর নাম শূন্য-বিন্দু শক্তি। আর এ থেকেই মহাবিশ্বের সবচেয়ে অদ্ভুত শূন্যের উৎপত্তি। শূন্যতার ভূতুড়ে শক্তি।

১৯০০ সালে জার্মান পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানীরা অতিবেগুনি বিপর্যয় নিয়ে জানার চেষ্টা করেন। তারা নিবিড়ভাবে পরিমাপ করলেন, বিভিন্ন তাপমাত্রায় একটি বস্তু থেকে কী পরিমাণ বিকিরণ বের হয়। দেখা গেল, রেজি-জিন্স সূত্র দিয়ে আসলে বস্তু থেকে আসা আলোর সঠিক পরিমাণ বের করা যায় না। তরুণ পদার্থবিদ ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক নতুন উপাত্ত তলিয়ে দেখলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি করলেন নতুন একটি সমীকরণ। রেলি-জিন্স সূত্রকে হটিয়ে জায়গা দখল করল এ সমীকরণ। প্ল্যাঙ্কের সূত্র নতুন পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলো। তারচেয়ে বড় কথা হলো, সমাধান করল অতিবেগুনি বিপর্যয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে প্ল্যাঙ্কের সূত্র লাফ মেরে অসীমে চলে গেল না। তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমার সাথে সাথে শক্তি বড় থেকে আরও বড় হওয়ার বদলে কমতে থাকল (চিত্র ৪৭)। তবে দূর্ভাগ্য পিছু লেগেই রইল। প্ল্যাঙ্কের সূত্র ঠিকই ছিল। তবে এর পাল্টা আঘাতখানি এর সমাধান করা অতিবেগুনি বিপর্যয়ের চেয়ে ঝামেলাপূর্ণ।

চিত্র ৪৭: রেলি-জিন্স সূত্র অসীমের দিকে নিয়ে যায়। তবে প্ল্যাঙ্কের সূত্র সসীম থাকে।

সমস্যা সৃষ্টির কারণ, প্ল্যাঙ্কের সূত্র পদার্থবিদ্যার পরিসংখ্যানিক গতিবিদ্যার সাধারণ অনুমান (assumption) থেকে আসেনি। প্ল্যাঙ্কের সূত্র তৈরি করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার সূত্রে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। প্ল্যাঙ্ক পরে বলেছিলেন, কাজটি তিনি করেছেন মরিয়া ও বেপরোয়া হয়ে। কারণ বেপরোয়া না হলে একজন পদার্থবিদ পদার্থবিদ্যার সূত্রে এমন দৃশ্যত খামখেয়ালী কাজ করবেন না। প্ল্যাঙ্কের মতে, অণুদের জন্য বেশিরভাগ পথে চলাচল নিষিদ্ধ। কোয়ান্টা নামে শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্বীকৃত শক্তিতে তারা কম্পিত হতে পারে। এই স্বীকৃত মানের মাঝামাঝি অন্য কোনো মান থাকার এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এটাকে অদ্ভুত কোনো অনুমান মনে নাও হতে পারে। তবে বিশ্বকে দেখে এভাবে কাজ করে বলে মনে হয় না। প্রকৃতি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে না। পাঁচ ফুট আর ছয় ফুটের মাঝামাঝি উচ্চতার কোনো মানুষ থাকবে না—এমনটা ভাবা বোকামি। একটা গাড়ি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলবে, অথবা ৪০ মাইল, কিন্তু ৩৩ বা ৩৮ মাইলে চলবে না—এটা অদ্ভুত কথা। তবে কোয়ান্টাম গাড়ি ঠিক এভাবেই চলে। হয়তো আপনি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে চলছেন। কিন্তু অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিলেই বুম! পৌঁছে যাবেন ৪০ মাইল বেগে। এর মাঝে কোনো বেগ নেই। ফলে ৩০ থেকে ৪০-এ যেতে হলে আপনাকে দিতে হবে *কোয়ান্টাম লাফ*। একইভাবে কোয়ান্টাম মানুষ এত সহজে বড় হতে পারে না। কয়েকবছর তারা থাকবে চার ফুট লম্বা। এরপর হঠাৎ করে সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে বুম! উচ্চতা হয়ে যাবে পাঁচ ফুট২। কোয়ান্টাম অনুকল্প আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব অভিজ্ঞার বিপরীত।

প্রকৃতির কাজের সাথে বিপরীতধর্মী মনে হলেও প্ল্যাঙ্ক বললেন, আণবিক কম্পন কোয়ান্টায়িত। তবে এ অদ্ভুত অনুকল্পের মাধ্যমেই পাওয়া গেল বস্তু থেকে নির্গত আলোর কম্পাঙ্কের সঠিক সূত্র। সূত্রটা যে সঠিক তা বুঝতে পদার্থবিদদেরও সময় লাগেনি। কিন্তু তবু তারা কোয়ান্টাম অনুকল্প মেনে নেননি। কথাটা যে বড় বেশি অদ্ভুত!

কোয়ান্টাম অনুকল্পকে অদ্ভুত ধারণা থেকে স্বীকৃত সত্যে রূপ দেন এমন একজন মানুষ যার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। তিনি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। প্যাটেন্ট অফিসের ২৬ বছর বয়স্ক এক কেরানি। তিনিই পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বকে দেখালেন, প্রকৃতি মসৃণ বৃদ্ধির মাধ্যমে নয়, কাজ করে কোয়ান্টায়। পববর্তীতে নিজের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এ তত্ত্বের প্রধান বিরোধীও হন তিনি নিজেই।

আইনস্টাইনকে দেখে মোটেও বৈপ্লবিক মনে হয়নি। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যখন পদার্থবিজ্ঞান জগতে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছিলেন, আইনস্টাইন তখন চাকরি খুঁজতে জুতার তলা ক্ষয় করছিলেন। অর্থের ওভাবে পড়ে সুইশ প্যাটেন্ট অফিসে একটি অস্থায়ী চাকরি নেন। কাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরির চেয়ে যা অনেক নিম্নমানের। ১৯০৪ সালের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ও পুত্রসন্তানের বাবা হন। প্যাটেন্ট অফিসে খেটে মরছেন। মহান কিছু করার পথ কালেভদ্রে হয় এমন। কিন্তু ১৯০৫ সালের মার্চের তিনি এমন একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, যা শেষ পর্যন্ত তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। এ গবেষণাপত্রে তিনি আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার (photoelectric effect) ব্যাখ্যা দেন। এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও সবার নজর কাড়ে। কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার স্বীকৃতির সাথে সাথে স্বীকৃতি পেল শূন্যের রহস্যময় শক্তিও।

১৮৮৭ সালে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারটা করেন জার্মান পদার্থবিদ হাইনরিচ হার্ৎস। তিনি দেখলেন, অতিবেগুনি আলোর একটি রশ্মি প্লেটে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে পারে। ধাতব প্লেটে আলো পড়লে সেখান থেকে সহজেই ইলেকট্রন সহজেই ছিটকে বেরিয়ে আসে। আলোকরশ্মি দিয়ে স্ফুলিঙ্গ তৈরির এ ব্যাপারটা চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানীদের ধাঁধাঁয় ফেলে দিয়েছিল। অতিবেগুনি আলোয় থাকে প্রচুর পরিমাণ শক্তি। ফলে বিজ্ঞানীরা স্বভাবিকভাবেই ধরে নিলেন, পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে বেশ ভালো পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। তবে আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব অনুসারে, উচ্চশক্তির আলো তৈরির আরেকটা উপায় আছে। আলোকে করতে হবে উজ্জ্বল। এই যেমন অনেক উজ্জ্বল নীল রংয়ের আলো। এর শক্তিও অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোর শক্তির সমান হতে পারে। অতএব, একটি উজ্জ্বল নীল আলোও ইলেকট্রনকে পরমাণু থেকে বের করতে পারা উচিত। ঠিক যেমন পারে অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলো।

কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা মোটেও তা নয়। পরীক্ষার মাধ্যমে সেটা জানতে সময় লাগেনি। (উচ্চ কম্পাঙ্কের) অনুজ্জ্বল অতিবেগুনি আলোও ধাতব প্লেট থেকে ইলেকট্রনকে বের করতে পারে। কিন্তু কম্পাঙ্ক কমিয়ে একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তি মানের নিচে আনলে—আলোকে কিছুটা বেশিই লালের দিকে নিয়ে আসলে—হঠাৎ করে স্ফুলিঙ্গ তৈরি বন্ধ হয়ে যায়। আলো যতই উজ্জ্বল হোক, আলোর রং সঠিক না হলে ইলেকট্রনর আটকেই থাকে। কেউ বের হয় না। আলোর তরঙ্গ এমন কাজ করার কথা নয়।

আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার এ ধাঁধাঁর সমাধান করলেন আইনস্টাইন। তবে তাঁর সমাধান প্ল্যাঙ্কের অনুকল্পের চেয়ে বেশি বৈপ্লবিক ছিল। প্ল্যাঙ্ক প্রস্তাব করেছিলেন, অণুর কম্পন কোয়ান্টায়িত। আইনস্টাইন বললেন, আলো নির্গত হয় ফোটন নামের ছোট ছোট প্যাকেট অব গুচ্ছ আকারে। এ ধারণা আলোর স্বীকৃত ধর্মের বিপরীত। কারণ আইনস্টাইনের কথা মানলে মানতে হয়, আলোর তরঙ্গ নয়।

কিন্তু অন্যদিকে আলোকশক্তিকে ক্ষুদ্র প্যাকেটের গুচ্ছ ধরে নিলে আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ব্যাখ্যা সহজ হয়ে যায়। আলো ছোট্ট বুলেটের মতো। আঘাত হানে ধাতুতে। বুলেট গিয়ে ইলেকট্রনকে ধাক্কা দেয়। বুলেটের যথেষ্ট শক্তি থাকলে—কম্পাঙ্ক যথেষ্ট বড় হলে—এটি ইলেকট্রনকে মুক্ত করে আনে। অন্যদিকে আলোককণার শক্তি যথেষ্ট না হলে এর ধাক্কায় ইলেকট্রন মুক্ত হয় না। আলোককনা বরং ধাক্কা খেয়ে সরে যায়।

তথ্যনির্দেশ

১। পরম শূন্য তাপমাত্রার প্রকৃত মান (-২৭৩.১৫) ডিগ্রি সেলসিয়াস।

২। বাস্তবে আসলে দুই ধরনের ঘটনাই আছে। বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন দুই ধরনের চলক আছে। যে চলক নির্দিষ্ট মানের বাইরের কোনো মান গ্রহণ করতে পারে না সেটি বিচ্ছিন্ন। যেমন একটি ক্রিকেট ম্যাচে কয়টি ছক্কা হবে? ০, ১ বা ২ বা তার বেশি। ১ ও ২-এর মাঝে কিছু নেই। দৈনিক দূর্ঘটনা বা কল সেন্টারে আসা কলের সংখ্যাও এমন বিচ্ছিন্ন (discrete) চলক। মানুষের ওজন, উচ্চতা আবার অবিচ্ছিন্ন। কারও ওজন ৬৫.৩ কেজি যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে ৬৫. ৩১ও। এ দুই সংখ্যা বা যেকোনো দুই সংখ্যার মাঝের যেকোনো সংখ্যাই হতে পারে। এসব চলককে বলে অবিচ্ছিন্ন (continuous)।—অনুবাদক